কৃষক আন্দোলন পথের দিশারী

বর্ণালী পাইন

দেশ গরিব বটে!

সাহিত্যের এক শিক্ষার্থী ও শিক্ষক হলেও একজন নাগরিকও তো। তাই গত কয়েক মাস ধরে কৃষি আইন ও কৃষি আন্দোলন নিয়ে এই মাথার মধ্যে গিজগিজ করছে ভাবনা, উত্তর না-মেলা প্রশ্ন। ১৯৪৭-এর পর এতগুলো বছর পার হয়ে এসে দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে নির্দ্বিধায় বলা যায়, দেশ আমাদের সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে কোনও দিন জোরালোভাবে দারিদ্র দূরীকরণকে কার্যত মূল উদ্দেশ্য করে তুলতে পারেনি। একদিকে যেমন আকাশচুম্বি বাড়ি, বিভিন্ন সরকারি জমানায় নানান প্রকট দৃষ্টান্তমূলক অতি অপব্যয়, বৈভবের অঢেল আয়োজনে উপচে পড়া উচ্চবিত্ত জীবন, সোনাদানায় ভরপেট বিশিষ্ট কিছু মন্দির, অন্যদিকে প্রবল আর্থিক অনটন, রোজগারহীন অসংখ্য মানুষ, সঠিক ঘর নেই, শৌচালয় নেই, স্কুল নেই, জল নেই, বিদ্যুৎ নেই, হাসপাতাল নেই, হাসপাতাল থাকলেও পরিকাঠামো নেই, পরিবেশ নষ্টের অন্ত নেই, ঝড়ে ভাঙা ঘরের মেরামতি নেই, সর্ষের মধ্যেই ভূত। তাই ত্রাণের অর্থ চুরি বন্ধের উপায় নেই, প্রতিহিংসাপরায়ণ ক্ষমতাধরের দলবাজি, অবিচার, নিপীড়নের হাত থেকে রেহাই নেই।

মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষ বাকি জীবনটা জেলে কাটাবার আশঙ্কায় সত্য বলায় অনভ্যস্ত হয়ে গেছেন। যারা বিশেষভাবে সত্য বলতে ভোলেননি, কণ্ঠরোধের জন্য তাদের অনেকেরই গায়ে urban নকশাল ছাপ মেরে অনন্তকালের জন্য জেলে ভরে দেওয়া হয়েছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ভারতে আসাকে কেন্দ্র করে আহমেদাবাদে চার ফুট দেওয়াল তুলে দারিদ্র্য ঢাকার জন্য কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা রূপায়ণে "হতদরিদ্র" দেশের একশো কোটি public money খরচের খাতায় চলে গেছে।

Society Language and Culture

কৃষি বিল কৃষকবিরোধী

দেশজোড়া এমন কদর্য বৈষম্য ও হাড় হিম করা আতঙ্কের পরিবেশে সাধারণ নির্বাচনের সময় প্রার্থী কেনাবেচার সাথে টাকা দিয়ে ভোটার কিনে ফেলাও দস্তুর। এমন করেই নির্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছে জেতা-হারা। কাজকর্ম দেখলে সরকারকে প্রায়ই একটা রাজনৈতিক দল বলে মনে হয়। সরকারি বক্তৃতায়, নীতি নির্ধারণে দলতান্ত্রিক গোঁয়ার্তুমি প্রকট ও স্পষ্ট। কবির ভাষায় যতই বলি "এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না", তত ঘোরতর জানি, এই মাটিটাই আমার আজন্মের মাটি। আজ সক্রিয় সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ ও উগ্র হিন্দুত্ববাদের পথে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ভারতের মতো একটি বহুমাত্রিক দেশকে। দলগত, ধান্দাগত পরাক্রমে একটি একমাত্রিক Nation state বা জাতিরাষ্ট্রে পরিণত করার প্রবল প্রচেষ্টা চলছে – সেই পরাক্রমী প্রভাবশীলতায় সমস্ত নীতি নির্ধারণে একই পথ, একই মত অনুসরণ করা হয়। অনড় একমুখী রাজনৈতিক কৌশলের অবশ্যম্ভাবী ফল হয়েছে নোটবন্দী, GST, বেনজির আর্থিক পতন, সরকারি সম্পদ সরকারি উদ্যোগে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া, CAA, NPR, NRC, সাম্প্রদায়িক উস্কানি, সাংবিধানিক ধর্ম নিরপেক্ষতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হিন্দুত্বের জয়গান গেয়ে পৌরাণিক রামচন্দ্রের জন্মের ভিটে নির্ধারণ করেছে সর্বোচ্চ আদালত মুসলমানদের কোণঠাসা করার জন্য। ইতিহাস হার মেনেছে পুরাণ গল্পের নায়কের রমরমায়। দেশের মধ্যে জাতপাতের রাজনীতি কোমর বেঁধে বিকট হয়েছে। Detention camp-এ

অপরিচয়ের অনিশ্চয়তায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে দেশের মানুষকে। ভিনরাজ্যের শ্রমিক অতিমারিতে শত শত মাইল পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে চেয়ে কেউ পথেই অসুস্থ হয়েছেন, কেউ বেঁচে ফেরেননি।

এহেন জাতীয় প্রেক্ষাপটে সদ্য পাস হয়ে গেছে তিনটি কেন্দ্রীয় কৃষি বিল। তর্ক-বিতর্কের মধ্যে দেশজুড়ে উত্তাল হয়েছে কৃষক বিক্ষোভ, কৃষক আন্দোলন। কৃষক আন্দোলনের মূল শিকড় সরকারি নিয়ামকদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঙ্গত আশঙ্কা ও অবিশ্বাস। কৃষিপণ্যের জন্য সরকার নির্ধারিত যে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কৃষকরা পেতেন, এই বিলগুলি পাস হয়ে যাওয়ার পর সেই সহায়ক মূল্য পাওয়ার নিশ্চয়তা না থাকার আশঙ্কার কারণ অতি বৃহৎ পুঁজিপতি বা কর্পোরেটদের রমরমা। নব্য নীতি অনুযায়ী ছোট বা মাঝারি আড়ৎদারের বদলে বৃহৎ পুঁজিপতির কাছে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে কৃষকদের। কৃষি পণ্যের জন্য Minimum Support Price দিতে সংসদে বিল আনা হচ্ছে না। অথচ সেই কাজটিই গুরুত্ব সহকারে করণীয় ছিল।

তিনটি কৃষি বিলের মধ্যে প্রথমটি অনুযায়ী, সরকার নিয়ন্ত্রিত পাইকারি কৃষিবাজার বা মান্ডিগুলি অকেজো হয়ে পড়বে। দ্বিতীয় বিল অনুযায়ী, ফসলের দাম পূর্ব নির্ধারিত হওয়ার কারণে চুক্তিভিত্তিক কৃষি বা Contract Farming এর পোয়াবারো হবে। তৃতীয় বিল অনুযায়ী, মজুতদারদের মজুতের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণে সরকারি নিয়ন্ত্রণ রাখা হবে না।

এমন গুরুতর সিদ্ধান্ত রাতারাতি নেওয়া হয়ে গেল খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে। ভোটের আগে মধুর বচন, দান-খয়রাতের প্রতিশ্রুতি আর ভোটের পর দলীয় কর্মসূচি রূপায়ণে সর্বাধিক উদ্যোগী একটি সরকার গণতন্ত্রের নিয়ম মেনে, সংবিধান মেনে কৃষকের আন্দোলনকে বিন্দুমাত্র মান্যতা দেননি। গণআন্দোলনকে মান্যতা না দেওয়ার মধ্যে সংবিধানের ভয়ানক বিপন্নতা স্পষ্ট। কিন্তু কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য না থাকার ঘোর অন্ধকার সময়ে সেই বিপন্নতা মিডিয়ার চোখে পড়ে না, খবরের কাগজের headline হয় না। কর্তাভজা মিডিয়া ছোঁক-ছোঁক করে গণআন্দোলনের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করার জন্য।

Society Language and Culture

কৃষক, ভোটব্যাঙ্ক, নানা জমানায়

এই অসময়ে মনে পড়ে ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০-এ কৃষক, ভাগচাষি, কৃষিশ্রমিকের সম্মিলিত ঐক্যে সংঘটিত তেভাগা আন্দোলনের কথা। আন্দোলনের ফলে কিছু উল্লেখযোগ্য সুফল মিললেও কৃষকের সামাজিক অবস্থান মূলত একই থেকে গিয়েছিল। রক্ত ঝরিয়ে, জীবন বলি দিয়ে কিছু দাবি আদায় সম্ভব করা এক কথা আর সামাজিক নিরিখে সামাজিক অবস্থানের রূপান্তর ঘটানো আর এক কথা। জওহরলাল নেহরুর welfare state-এর agenda ভারতভূমিতে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি তার ত্রুটিগত ব্যর্থতায়। দেশের আর্থিক বুনিয়াদ স্বনির্ভর ও পোক্ত করার আর্থিক নীতি ও কাঠামোর বদলে যা বাস্তবে প্রয়োগ হয়েছে তার পরিণতি গরিবকে আরও গরিব, ধনীকে আরও ধনী বানিয়ে তুলেছে।

মেহনতি মানুষের ভালো থাকার অধিকার, সমাজবদলের স্বপ্ন সত্য করতে ১৯৬৭-এর ২৫ মে ভূমিহীন কৃষকেরা নকশালবাড়িতে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন। তাঁদের স্বার্থে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন মেধাদীপ্ত শিক্ষিত শহরের তরুণ-তরুণীরা। ভোটের লড়াই যারা লড়ে, তেমন ডান, বাম কোনও দলই কিন্তু এই সমাজ পরিবর্তনের সশস্ত্র আন্দোলনকে সেই সময়ে সমর্থন করেনি। উল্টে, আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য আন্দোলনের গতি থামিয়ে দেওয়ার

জন্য তাদের কুটিল সক্রিয়তা ও নৃশংসতার অন্ত ছিল না। নকশালদের ওপর রাষ্ট্রের অত্যাচার বিপ্লবীদের ওপর ব্রিটিশদের অত্যাচারকে কোথাও কোথাও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

অর্থনৈতিক সংস্কারের যুগে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা তীব্রভাবে জরুরি হয়ে পড়ে। উন্নয়নের রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা থেকে আন্দোলনের জন্ম হয়। আন্দোলনকে বিনষ্ট করার জোরালো চেষ্টা করে রাষ্ট্র ও তার সহকারী শক্তিরা। এইটাই বার বার হয়ে এসেছে এই দেশে। একদা "লাঙল যার জমি তার" আন্দোলনের শরিক বামপন্থী রাজনীতিকরা পশ্চিমবঙ্গে টানা ছ'বার ক্ষমতায় থেকেও শিল্পক্ষেত্রে এগোতে পারেননি। সপ্তমবারের জন্য ক্ষমতায় এসে সেই তাঁরাই উদার অর্থনীতি মেনে নিয়ে "পুঁজি যার জমি তার" নীতির ভরসায় সিঙ্গুরের উর্বর কৃষিজমি মোটর গাড়ির কারখানা করার জন্য টাটাকে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে "ট্রেড সিক্রেট" বলে উল্লেখ করে বাম মনোভাবাপন্ন মানুষকেও আশাহত করেন ও কঠিনভাবে সমালোচিত হন। অর্থনীতির বুনিয়াদ ও কাঠামো তৈরিতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এই দেশের মানুষের কপালে কোনওদিনই জোটেনি। তাই বিজ্ঞানসম্মত ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা হয়নি আজও। সিঙ্গুরের পর নন্দীগ্রামেও জমি অধিগ্রহণ নিয়ে প্রবল প্রতিরোধ আক্রমণ গড়ে ওঠে। সে সময় রাজ্যে হাজার হাজার বন্ধ কারখানার জমি বা অনাবাদি পতিত জমি কীভাবে ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকার ভাবতে পারেননি।

"কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ" স্লোগান তুললেও চা শ্রমিকদের আত্মহনন বন্ধ করা যায়নি। কৃষিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক প্রয়োগ হয়েছে, জৈব পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা স্বীকৃত হয়নি। কৃষককে সব সময় বশংবদ করে রাখতে শাসকশ্রেণি চিরকাল সক্রিয় থেকেছে। সবরকম নেতার কাছেই এই দেশে কৃষিজীবী মাত্রেই ভোটব্যাঙ্কের অঙ্ক মেলানোর ঘুঁটি। সেই কারণেই এই ফিরে দেখাটুকু বর্তমান পটভূমিতেও অপরিহার্য।

Society Language and Culture

কৃষক আন্দোলন পথ দেখাচ্ছে

বর্তমান কৃষক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে দীর্ঘ তেষট্টি দিন দিল্লির প্রচণ্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে। সব বাধা সত্ত্বেও কৃষকদের প্রতিরোধ অবস্থান জারি থেকেছে। প্রাণ হারিয়েছেন ১৫৭ জন আন্দোলনকারী কৃষক। এরপরেও সাধারণতন্ত্র দিবসের দিন যে ধৈর্য ও সংঘবদ্ধতা দেখেছে গোটা দেশ, তাকে নজিরবিহীন বললে অতিরঞ্জন হয় না। দেওয়ালে পিঠ কতখানি ঠেকে গেলে প্রায় তিন লাখ ট্রাক্টর নিয়ে মিছিল চলে, সঙ্গে অগণিত পায়ে হাঁটা মানুষ। টিকরি সীমান্তে, সিঁঘু সীমান্তে, গাজীপুর সীমান্তে আন্দোলনরত কৃষক বাহিনীর ওপর পুষ্পবৃষ্টি করে সমর্থক জনতা। তিনটে সীমান্ত পার হয়ে বারবার পুলিশি ব্যারিকেড অতিক্রম করে ওই বিশাল মিছিল রাজধানী দিল্লির লাল কেল্লায় পৌঁছে যায়। তিনটি কৃষি বিল রদের দাবি পূরণ না হলে ২৬শে জানুয়ারি এই বিশাল ট্রাক্টর মিছিল দিল্লি ঢুকবে, এই কথা নতুন বছরের দু'তারিখে স্পষ্ট ঘোষণা করেছিল সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা। তিনটে আইনের প্রতিলিপি জ্বালিয়ে লোহরি / সংক্রান্তির দিন 'কিষাণ সংকল্প দিবস' পালিত হয়েছিল। দেশজুড়ে এই দিনটি কৃষিভিত্তিক দেশ ও কৃষিজীবী মানুষের নতুন ফসল ঘরে তোলার দিন। অর্থাৎ উৎসবের দিন, একতার দিন। সেই দিনটি তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেছে নেওয়ার কারণ স্পষ্ট।

"সেদিন (২৬শে জানুয়ারি) অন্ততপক্ষে দু'লক্ষ ট্রাক্টর ছিল দিল্লির রাস্তায়। সেই অনুপাতে অসংখ্য মানুষ। দিল্লির একটা দোকানও লুট হয়েছে? সাধারণ নাগরিকদের একটা গাড়ির একটা কাঁচও ভেঙেছে? একটা ফুলও ছেঁড়া হয়েছিল রাস্তার পাশের কোনো বাড়ি থেকে? একটা মেয়েকে কেউ উত্যক্ত করেছে কোথাও? আটকানো হয়েছে

একটাও অ্যাম্বুলেন্স? ওই জড়ো হওয়া মানুষগুলি সরকারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা নিশ্চয়ই করছেন কিন্তু এঁরা কেউ হিংসক স্বভাবের নন।"

বক্তা প্রায় আশি বছর বয়সের অমিতাভ মিশ্র। মানুষটি গত প্রায় ষাট বছর দিল্লি আইটিও-র নিকটবর্তী বাসিন্দা। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি সুখ্যাত পরিবেশবিদ শ্রী অনুপম মিশ্রের দাদা।

একটি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে বিকৃতভাবে দেখানোর নানারকম ষড়যন্ত্রের শুরু গোড়া থেকেই হয়েছে। আন্দোলন ভেঙে পড়েনি। ২৬শে জানুয়ারির ঐতিহাসিক মিছিলের পরের দিনই টিকরি মোর্চা গেটের বিশাল কৃষক সমাবেশের ছবি দেখা গেছে ট্রলি টাইমসে। যতদিন অধিকার অর্জন না হবে, এই লড়াই চলতে থাকবেই। ২৬শে জানুয়ারি লাল কেল্লায় পৌঁছে কৃষকরা সম্মিলিতভাবে বোঝাতে পেরেছেন যে তাঁদের চোখে তিন কৃষি বিল কালা আইন এবং এর শেষ দেখেই ওঁরা ছাড়বেন।

আত্মবিক্রীত Media

আন্দোলনের প্রকৃত সমর্থক হওয়া সোজা কথা নয়। সমর্থনকারীকে ভুল বোঝানোর রাষ্ট্রীয় চেষ্টা ওঁত পেতে আছে, সঙ্গে আছে লক্ষ্মণ ভাই media। প্রকৃত যা ঘটেছে, তা খবরে দেখায়নি media, এত দীর্ঘ শৃঙ্খলাদৃপ্ত ট্রাক্টর মিছিলের মূলে যে আত্মবিশ্বাস, নিজেদের দাবির প্রতি নিষ্ঠা প্রতিফলিত হল, media তা দেখতেই পেল না। তিন কৃষি আইন যদি কৃষকের স্বার্থেই হবে, তবে ক্ষিদে-তেষ্টা বিসর্জন দিয়ে এইভাবে কোনও গণআন্দোলন চলতে পারত না, অঙ্কুরেই বিনষ্ট হত। আন্দোলনকারী অন্নদাতা কৃষিজীবি, তাই তাঁদের সমর্থন করবেই আপামর মানুষ, যাঁরা জানেন, এত বড় গণআন্দোলন ভারতভূমি বহু বছর চাক্ষুষ করেনি। বিশ্ব ক্ষুধা তালিকায় নিম্নতম স্থানে থাকা ভারতে অর্থনৈতিক বৈষম্য অশ্লীল মাত্রায় ঘৃণ্য। কৃষকের ক্রমাগত আত্মহত্যা এত বছরেও কোনও সমাধানের পথ দেখায়নি। তাই সমর্থনকারীদের এককাট্টা হওয়ার গুরুত্ব এককাট্টা না হলে স্পষ্ট বোঝা যাবে না কিন্তু আন্দাজ অবশ্যই করা যাবে।

Society Language and Culture

এই অবধি লিখে খবর পেলাম ২৮শে জানুয়ারি আন্দোলনকারীদের দিল্লি-গাজীপুর সীমান্ত থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে যোগী সরকার জল ও বিদ্যুতের লাইন কেটে দিয়েছে। কৃষক নেতা রাকেশ টিকয়েট-সহ 'সংযুক্ত কৃষক মোর্চা' ও 'অল ইন্ডিয়া কিষাণ ইউনিয়ন'-এর ডাকে আরও কৃষকের বিশাল জমায়েত হয়। প্রতিরোধ আটকাতে রাষ্ট্রশক্তি সক্রিয় তার পরিচিত পদ্ধতিতে। মানুষের প্রয়োজনের ন্যূনতম জল, ভ্রাম্যমান শৌচালয়, বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া ক্ষমতার জবরদস্তিতে আন্দোলনের চরমতম ক্ষতির নামান্তর।

বিভেদহীন লড়াই

অধিকার অর্জনের লড়াইয়ের এই মাটি কামড়ে মাথা সোজা করে চলা আন্দোলন আয়েশি, বিলাসী, ভ্রষ্টাচারী রাজনীতিকদের দুশ্চিন্তায় রেখেছে। নিজের সন্তানকে যাঁরা হাজারে হাজারে সেনা বাহিনীতে যোগ দিতে পাঠিয়েছেন, আজ সেই সব মানুষের ওপর দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনছে রাষ্ট্র। আন্দোলন কিন্তু ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে মুজফ্ফরনগর, মথুরা, বাগপতেও। প্রাত্যহিক জলপানের আবশ্যিক বাসন লোটায় খাদ্যের আবশ্যিক বস্তু নুন গঙ্গাজলে মিশিয়ে ঐতিহাসিক শপথ নিয়েছেন কৃষকরা। ব্যক্তিগত বিভেদ ভুলে সমষ্টির ন্যায্য দাবিকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এই শপথ হিন্দি বলয়ে হিন্দুত্ববাদী বিভেদনীতিকে অগ্রাহ্য করেছে।

আন্দোলনের সমর্থনটাও আন্দোলন

আমাদের জীবনে সরকারের প্রয়োজন জনহিতকর কাজের জন্য। জনরোষ সৃষ্টি করা সরকারের সাফল্য নয়, ব্যর্থতা। আরও স্পষ্ট করে বললে বিধ্বংসী ব্যর্থতা। সমস্ত মানুষই চায় সরকারের ওপর নির্ভর করে নিরাপদে উন্নয়নশীল পথে সামনে এগোতে। মিথ্যের পথে সেই কাজটা কোনওদিন সম্পন্ন হতে পারে না।

মিথ্যের ঐতিহাসিক হার দেখার জন্য তাই সজাগ অপেক্ষা আমাদের। যাবতীয় ism থেকে মুক্ত হয়ে বলিষ্ঠ সত্যর শক্তিকে তার মর্যাদা দিতেই হবে। আন্দোলনকারীকে সমর্থন করাটাও আন্দোলন। সেই আন্দোলনটাও যেন শিথিল বা লঘু না হয়।

(Smt. Barnali Pain is an Author, Social Activist and Associate Professor of English, S.A. Jaipuria College, Kolkata, West Bengal)

Society Language and Culture